

[দুঃসহ কিছু স্মৃতি](https://www.bangabandhuonline.org/12403/)

শেষ শ্রাবণের রাত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা থাকলেও বৃষ্টি ছিল না। কালো মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছিল চাঁদকে। হয়ত বৃষ্টি হয়েছে কাছে কোথাও। বাতাস তাই শীতল। কিন্তু রমনায় বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হয়নি ধানমণ্ডি লেক-ঘেঁষে বত্রিশ নম্বর সড়কের বাড়িটিতে; যেখানে থাকেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর। আগামীকাল তাই তিনি আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। উৎসবের সাজে সেজেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন। স্বাধীনতার আগে মধ্য ষাটে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী\_ ১৯৬৫ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুধু বর্জন করিনি, আমাদের যুগপৎ আন্দোলনে ষাটের দশকে কোনো সমাবর্তন হতে পারেনি। তার পরের ইতিহাস\_ ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের জোয়ার আর বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও অভ্যুদয়ের ইতিহাস; যার অংশীদার আমরা, যারা তখন নবীন, যুবা ও তরুণ। আমাদের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতার এমন মিলিত ঐক্য বাংলাদেশ আর দেখিনি। সেই দুর্মর সময়ে কত যে ভয়ঙ্কর রাত ও দিন পেরিয়ে এসেছি\_ তা আমাদের সবার অভিজ্ঞতায় কত রকম বেদনার দাগ কেটেছে; তবে স্বাধীন দেশে যে এমন একটি সময়ে আমাদের হৃদয়ে কালো রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হবে, তা কি আমরা কখনও স্বপ্নে ভেবেছি? ভেবেছিলাম এসব কথা লিখব না। দীর্ঘ ৩৮ বছর অতীত হলো, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মানচিত্রে কত লোক এলো ও গেল। কতজন কত কথা বলল ও লিখল। কল্পকথা ও বাস্তবতা মিলিয়ে তাতে কার কি এসে গেল? আমার মতো সামান্য ব্যক্তির স্মৃতিকথায় কী আসে যায়? কিন্তু পরে ভাবলাম বঙ্গবন্ধুকে এত কাছে থেকে দেখেছি; তাই সেই ভয়ঙ্কর দিবসের কথা কিছু বলা উচিত।

রাত তখন নবীন। বিটিভির রাত ৯টার সংবাদের পর ওয়ারী লারমিনি স্ট্রিটে নিজস্ব ঠিকানায় ফিরব। বিটিভির তরুণ প্রকৌশলী লোকমান আহমেদ বলল, চল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। অ্যারেজমেন্টটা দেখে আসি। ভাবলাম আমাকেও সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সব রাষ্ট্রীয় কভারেজের স্টোরি করার দায়িত্ব তো আমার। দেখে আসি টিএসসিতে আয়োজন কতদূর। প্রকৌশলী লোকমান এলো সমাবর্তনের লাইভ টেলিকাস্টের যাবতীয় তদারকির কাজে, আর আমিও সঙ্গে। লোকমানকে বললাম\_ ‘দেখো ভাই তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি-না?’

টিএসসিতে লোকমান ও আমি টিভি কভারেজের এসব দেখতে দেখতে অদূরে কিছু ছাত্রছাত্রীকে দেখলাম আলপনা আঁকতে। এদের অধিকাংশই চারুকলার ছাত্র-ছাত্রী। তাদের কাছাকাছি শেখ কামাল দাঁড়িয়ে কী যেন বলছেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। কুশল বিনিময় এবং শেখ কামাল আমার সঙ্গে করমর্দন করার পর জানতে চাইলেন কাল কী কী করা হবে? শেখ কামাল আগে থেকেই আমাকে চিনতেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক সেই ভাষণের পর থেকে, প্রতিরাতে রাত ৯টার সংবাদের পর আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতাম আগামী দিনে কী কী করতে হবে তার নির্দেশনা নিতে। আর সেজন্য প্রায়শ শেখ কামালের সঙ্গে দেখা হতো। ২৫ মার্চের রাতেও যথারীতি ৯টার সংবাদের পর আমি প্রয়াত হুমায়ুন চৌধুরী (বিটিভির তদানীন্তন বার্তা প্রধান), সিনিয়র রিপোর্টার এ জেড এম হায়দার (প্রয়াত), সংবাদ পাঠক ইকবাল বাহার চৌধুরীর গাড়িতে বত্রিশ নম্বরে গেলে দেখলাম শেখ কামাল নিচতলার বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আমরা যেতেই বললেন, বাবা খুবই অস্থির আছেন। দেখলাম বঙ্গবন্ধু ইপিআরের ওয়্যারলেসে উচ্চস্বরে কথা বলছেন আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমরা সামনে যেতেই বললেন, তোরা তাড়াতাড়ি বাড়ি যা, আজ কোনো কথা নেই। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম এবং আমরা চারজন তাঁর নির্দেশমতো তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছিলাম। হুমায়ুন চৌধুরীকে ইস্কাটনে আর আমাকে সর্বশেষ পুরানা পল্টন লাইনে (মধু চৌধুরীর বাড়ির গলি) নামিয়ে ইকবাল ভাই রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পেছনে তার শান্তিনগরের পৈতৃক বাড়িতে যখন ফিরছিলেন তখন রাত এগারোটা। রাত ১২টায় শুরু হয়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ।

১৪ আগস্ট রাতের কথায় আবার ফিরি। শেখ কামাল আমার চাইতে বেশ ক’বছরের ছোট হবেন। বয়সের ব্যবধানের কারণে আমাদের সম্মান করে কথা বলতেন। আজও বললেন, আপনাদের ওবি ক্যামেরা তো এতদূর আসতে পারবে না, জিয়া ভাইকে বলবেন এই সাজসজ্জা, আলপনাগুলো যেন ভালোভাবে তোলেন।’ একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগোক্তির মতো করে বললেন ‘বৃষ্টি হলে এদের সব পরিশ্রম বিফলে যাবে। তার স্ত্রী সুলতানা কামালের বড় বোন খালেদা আমাদের সমসাময়িক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পড়ত। তাদের বড় ভাই জাহাঙ্গীর ভাই আমাদের অগ্রজ। আমাদের বিদায় দিয়ে শেখ কামাল কত রাত পর্যন্ত টিএসসি চত্বরে ছিল জানি না। তবে টিভি প্রকৌশলীদের গাড়িতে করে লোকমান আমাকে যখন আমার ওয়ারীর নিবাসে পেঁৗছাল, তখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। আমার স্ত্রীও প্রায় আমার কাছাকাছি সময়ে বাসায় পেঁৗছেছে সেদিন। আমাদের সতীর্থ বাংলা বিভাগের হাসনাহেনা বকুলের সঙ্গে সে এবং আরও কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের বাসায় গিয়েছিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তিনি আমাদের সমসাময়িক ছিলেন, ভোলা সিংহ নামে খ্যাত এই নেতা পড়তেন সয়েল সায়েন্সে। আমি ও বকুল বাংলায়, আমার স্ত্রী পিনকী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল। পিনকী ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদিকা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৬৫-১৯৬৬ শিক্ষাবর্ষে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিল সে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমারই মতো। সেই সময়ে ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও ধারার ছাত্রনেতা-নেত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তোফায়েল আহমেদের বাসায় সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মতো তুমুল আড্ডা দিয়ে এসে সে পরিতৃপ্ত। অথচ কেউ জানত না কি নিদারুণ এক রাত অপেক্ষমাণ। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ ও আত্মদানকারী অনেক নিকটজন কেউ কি জানতেন?

রাত করে ঘুমোতে যাওয়ার জন্য পরদিন সকালে বিলম্বে বিছানা ছাড়ার কথা নয়। কিন্তু ভোরের আলো ভালো করে ফোটার আগেই দরোজায় করাঘাত ও চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমাদের পাড়াতুত ভাগ্নে বাদশা সারা, লারমিনি স্ট্রিট কাঁপিয়ে চিৎকার করছে, ‘তোমরা ঘুমায়ে আছো, বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে।’ কি এক অবিশ্বাস্য বার্তা আমাদের কাছে। আমি ততোধিক চিৎকার করে বললাম বিশ্বাস করি না। বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন সমাবর্তন উৎসবে, আমিও যাব কভার করতে। আশপাশের কেউ বিশ্বাস করছে না। বাদশা বলল রেডিও শোনেন। আমি ট্রান্সমিটার চালু করতেই মেজর ডালিমের দর্পিত কণ্ঠস্বর শুনলাম। আমি রেডিও বন্ধ করে বললাম, বিশ্বাস করি না, এটা কোনো ঈষধহফবংঃরহব জধফরড় হবে। অ্যাডভোকেট নূরুল আলম খুবই চিন্তায় পড়লেন এবং টেলিফোনে খবর নেওয়ার জন্য ওপরে গেলেন। ষোলো নম্বরে সাত-আটটি পরিবারের মধ্যে একমাত্র তার ঘরেই টেলিফোন ছিল একটি, কিন্তু অনেক চেষ্টা করে তিনি বিফল হলেন। টেলিফোন বিকল। সম্ভবত সুইচ রুম থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি সকাল ৭টার রেডিওর খবরের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাতটা বাজলে সময় সঙ্কেত দিয়ে বেতারে পাঠ করতে শুরু করলেন সরকার কবিরউদ্দিন এবং তাঁর কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে এই প্রথম বিশ্বাস করলাম। সেই সকালে বেতারের খবর খুবই অগোছালো ছিল এবং কবির ভাইও যেন কম্পিতকণ্ঠে পাঠ করছিলেন। পরে জেনেছি মেজর শাহরিয়ার ও মেজর ডালিম দু’জনই বাংলাদেশ রেডিও অফিস নিয়ন্ত্রণ করছিল। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের মতো করে প্রচারিত খবরটা তৈরি করা হয়। সরকার কবিরউদ্দিন তাঁর নির্ধারিত সংবাদ পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ভোরে খবর পড়তে এসে আর্মির লোকজন ও শাহবাগের বেতার ভবনের বাইরে ট্যাঙ্ক দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই তাকে ধরে স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হয়। বেতারের বার্তাকক্ষেও সকালের বুলেটিনের দায়িত্ব পালন করতে যেসব সংবাদকর্মী এসেছিলেন তারা সবাই নজরবন্দি হয়ে যান সেদিনের জন্য।

বেলা ১০টার দিকে বাদশা হন্তদন্ত হয়ে আবারও এলো। আমাদের ঘোর তখনও কাটেনি। তাকেও খুব উৎকণ্ঠিত দেখাল। বলল\_ কামালের বন্ধু হারুন হল থেকে পালিয়ে তাদের বাসায় এসেছে। তাদের বাসা হারুনের জন্য নিরাপদ নয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের চেনাজানা সবাই জানে বাদশার মেঝবোন শেফালীর সঙ্গে হারুনের বিয়ে ঠিকঠাক। সামনে হারুনের লেখাপড়া ও নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন করার জন্য পিনকী আমাদের আড়াই কামরার ছোট ঘরটা কামালের বন্ধু হারুনের জন্য ছেড়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে একেবারে বিহ্বল। হারুনের কাছে শোনা গেল\_ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি। ছাত্রলীগের সব নেতাকর্মীর হল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে যাবার খবর। হারুন সেই ঘরে লুকিয়ে থেকে অনেকদিন নির্বিঘ্নে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন তিন। শেফালীর কোলে কোলে মানুষ এবং তাকে ডাকে বন্ধু বলে। মায়ের কোলে চড়ে জ্ঞান হওয়া অবধি তাকে ক্যালেন্ডার, পত্রিকায় কিংবা দেয়ালে কোথাও বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখলে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত ‘সেক মুজিক’। তিন বছরের শিশুটি আমাদের কথাবার্তায় কিছু একটা আঁচ করে বেশ বিমর্ষ। শেফালী স্বাভাবিকভাবেই কোনো অজানা পরিস্থিতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। শেফালীর হাত ধরে আমার ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে। দুই অসম বন্ধুর উদ্বিগ্নতার মধ্যে বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিটিভির একটি ঝরঝরে পুরনো মাইক্রোবাস। ড্রাইভার নেমে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিল, বার্তাপ্রধান হুমায়ুন চৌধুরীর দুই ছত্রের পত্র ‘আমরা সবাই বঙ্গভবনে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি চলে এসো।’ ঘড়িতে তখন ১৫ আগস্টের বেলা এগারোটা। ড্রাইভারকে পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য বললাম ‘বঙ্গভবন আমার বাসার খুব কাছে। তুমি যাও, আমি নিজেই চলে যাব। ড্রাইভার চুন্নু মিয়া খাস ঢাকাইয়া এবং স্পষ্টবাদী। ত্বরিত বললেন\_ আপনারে বাইন্ধা নিয়া যাইতে কইছে। জলদি গাড়িতে উইঠা পড়েন। গাড়ি ছাড়া গেলে মগর আপনারে আর্মিরা গেইটে পঙ্গু করব। চুন্নু মিয়ার মর্জি মোতাবেক গাড়িতে উঠে বসতেই জোরে গাড়ি টান দিয়া বলে উঠল, ‘স্যার কালা ট্যাঙ্কের আর্মিরা পাওয়ার লইয়া লইছে। শেখরে মাইরা ফ্যালাইছে। তখন শুনতাছি মুস্তাকরে নাকি পেরসিডেন্ট বানাইব।’ সর্বনাশ খন্দকার মোশতাক হবে প্রেসিডেন্ট যিনি কি-না মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে বসেই তাজউদ্দীনের বিরোধিতা করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের অপচেষ্টা করেছে। বঙ্গবন্ধু কেন যে এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না জীবৎকালে, তাঁর রক্তের দামে জাতির কাছে লোকটির স্বরূপ উন্মোচিত হলো। মনের মধ্যে কুঁকড়ে ওঠা ভাবনাগুলো নিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে নামলাম বঙ্গভবনে।

বঙ্গভবনে এসে দেখি বিটিভির মহাপরিচালক জামিল চৌধুরী, পরিচালক (প্রশাসন/অনুষ্ঠান) মনিরুল ঢাকা কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মুস্তাফা মনোয়ার, বার্তাপ্রধান হুমায়ুন চৌধুরী, অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মামুনসহ অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল শাখার অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছেন। এদের আনা হয়েছে যে-কোনো মুহূর্তে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান প্রচার ও ধারণের জন্য। আমাদের সবাইকে একটা কক্ষে বসতে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে আমি ক্যামেরাম্যান জিয়াকে দেখলাম। পিআইডি এবং দুটি সংবাদপত্রের দু’জন ফটোগ্রাফারকে দেখলাম যারা আমার খুব চেনা ও বেশ সিনিয়র। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এতদিন সংযুক্ত বিটিভির ক্যামেরাম্যান স্বাভাবিক কারণে যতই বিষাদগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত হলেও আমাকে দেখে তাকে বেশ আশ্বস্ত মনে হলো। আমাকে কী করতে হবে জানি না। জিয়াও জানে না তার কি করণীয়। জামিল চৌধুরী সাহেব ও হুমায়ুন চৌধুরী পাশের একটি কক্ষে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছেন খুবই ত্রস্ত পায়ে। উভয়ের মুখ পাংশুবর্ণ কোনো নির্দেশনা পেয়ে, মনে হলো। আমরা যারা একটি কক্ষে বসে ছিলাম সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আর ফিসফিস গুঞ্জন। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আর কাদের হত্যা করা হয়েছে? বত্রিশ নম্বর কেমন আছে? গতকাল রাতেই তো আমি শেখ কামালকে দেখেছি। লোকমানই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল টিএসসিতে লাইভ টেলিকাস্টের আয়োজন পর্যবেক্ষণে। ফিসফিস করে বললাম আমার সহকর্মীদের কানে কানে। বেলা ১টার দিকে জিয়া ও আমার ডাক পড়ল যে কক্ষে জামিল চৌধুরী সাহেব ঘন ঘন যাতায়াত করছিলেন, সেই কক্ষে। দেখলাম সেই কক্ষে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর বসা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে রাত জাগার আভাস। এই প্রথম জানলাম বত্রিশ নম্বরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিয়াকে ও আমাকে। জিয়াকে তো অবধারিতভাবে যেতে হবে। কিন্তু বাদ সাধল আমাকে নিয়ে। আমার অনীহা দেখে তাহের উদ্দিন ঠাকুর জামিল চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলেন জিয়ার সঙ্গে কে যাবে? হুমায়ুন চৌধুরী আমার নাম প্রস্তাব করতেই আমি জামিল সাহেবকে বললাম ‘স্যার আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর প্রায় সকল কভারেজের রিপোর্ট করেছি তার সঙ্গে থেকে। কিন্তু তার মৃত্যুর দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না।” জামিল চৌধুরী মেনে নিলেন।

সাংবাদিকতার জগতে বিচরণ করি বলে তাহের উদ্দিন ঠাকুরও আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সুপরিচিত। আমার অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি আর জোর করলেন না। কিন্তু হঠাৎ করে মুস্তফা মনোয়ার সাহেব বললেন জিয়া আমি তোমার সঙ্গে যাব। একটি আর্মি জিপে জিয়া, মোস্তফা মনোয়ার এবং আরও দু’জন স্থিরচিত্র গ্রাহক গোলাম মাওলা ও কামরুজ্জামান বত্রিশ নম্বরের দিকে রওনা হলেন। পরে জেনেছি ধানমণ্ডির তিন নম্বরের মাথায় মুস্তাফা মনোয়ার সাহেব শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে জিপ থেকে নেমে সেন্ট্রাল রোডে (এখন শহীদ মুনীর চৌধুরী সড়ক) তার বোনের বাসায় চলে যান। আসলে মুস্তাফা মনোয়ার আপাদমস্তক শিল্পী মানুষ। বড় কোমল মন। ওই করুণ মৃত্যুদৃশ্য সহ্য করার মতো মন-মানসিকতা নেই। মুস্তাফা মনোয়ার যাননি। আমি যাইনি। কী করে যাব? যে মানুষটাকে চিনতাম রক্তস্নাত দেহ নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে, কী করে তা দেখব। মনে পড়ে চুয়াত্তরের মহাপ্লাবনে বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন উপদ্রুত এলাকায় রাশিয়ান বেল হেলিকপ্টারে। বিশাল হেলিকপ্টারের সামনে দুটি আসনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পানি সম্পদ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী। পেছনে হেলিকপ্টারের দু’পাশে লম্বা বেঞ্চ পাতা। আসনে আমরা সমাসীন তার সফরসঙ্গী। বাঘা বাঘা সাংবাদিক। তোয়াব ভাই পেছনে আমাদের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু একাধিক স্থানে নামেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের তদারকের বিষয়ে জানতে চান ইত্যাদি এবং আমরাও তার সঙ্গে দৌড়াই। কোথাও কোথাও হ্যান্ডসেট মাইক্রোফোনে তিনি ছোট্ট বক্তব্য রাখেন। সেবার প্রায় আট ঘণ্টা হেলিকপ্টারে কাটাই। একটি স্থানে আমাদের দৌড়াদৌড়ি কর্মতৎপরতা থামিয়ে বলেন ‘কিরে তোদের ক্ষিধা লাগে নাই। তোয়াব ওদের খাবার দাও।’ এমনি করে কোনো একটি স্থানে নামার মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন ‘এই তোর মুখ কালো কেন? মুখ ব্যাজার ক্যান?’ আমি কিছু বলার আগে সাইফুল বারী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘দ্যাখ তো ওর কি প্রবলেম।’ বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়েন এবং ওই এলাকা পরিদর্শন শেষে হেলিকপ্টার আবার উড়তে শুরু করলে সাইফুল বারী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আমার মন খারাপের কারণ কী? আমি আমার শিশুকন্যার অসুখের কথা বললাম। সব শুনে সাইফুল বারী বললেন, তার মেয়েরও ওই ধরনের অসুখ ছিল এবং আমাকে পরের দিন তার বেইলি রোডের বাসায় যেতে বললেন। সাইফুল বারীর বড় ভাই ইরফানুল বারীর চিকিৎসায় আমার শিশুকন্যা সুস্থ হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর কী প্রখর দৃষ্টি। তিনি আমার বেজার মুখ দেখে আঁচ করেছিলেন কোনো প্রবলেমের আর সাইফুল বারী সাহেবকে সমাধান করতে বলেছিলেন। বারী ভাইও সমস্যা সমাধান করে দিলেন যার ফলে পরম করুণাময়ের অসীম কল্যাণে আমার শিশুকন্যাটিকে আর অসুখে আক্রান্ত হতে হয়নি। আজ আটত্রিশ বছর পরেও সেদিনের কথা মনে হলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর সেই বঙ্গবন্ধু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চলে গেলেন। সপরিবারে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হলো স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে দেওয়ার জন্য।

পনেরোই আগস্ট বত্রিশ নম্বর থেকে জিয়াউল হক শূন্য ক্যামেরা নিয়ে ফিরেছিলেন। তার গৃহীত চিত্রসহ পুরো ম্যাগাজিন সেনা সদস্যরা নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে জিয়া বলেছিল, ‘আপনার বাসা কাছেই, চলুন আপনার বাসায় যাই।’ তাকে খুব বিমর্ষ লাগছিল। তাকে সঙ্গে করে বাসায় ফিরলে আমার স্ত্রী পিনকী ও আমাকে বঙ্গবন্ধুসহ সবার মৃত্যুদৃশ্যের করুণ বর্ণনা দেয় যা শুনে আমরা উত্তেজিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমরা দু’জন আবারও বিকেল ৪টা/৫টায় বঙ্গবভনে ফেরত যাই। কেননা আমাদের ওই সময় ফিরতে বলা হয়েছিল। কারণ নতুন মন্ত্রিসভার সবাই শপথ নেবেন। একজন একজন করে আসতে থাকেন শপথ গ্রহণ করতে, যাদের দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই, কারণ এরা বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটে ছিলেন। শুধু ৪ জন সেদিন আসেননি। সেই চারজন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে পরবর্তী সময়ে অবরুদ্ধ করা হয়, যাঁরা আর কোনোদিন বাংলাদেশের মুক্ত আলো-হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারেননি। সেই মর্মান্তিক কাহিনী এখন অন্য এক ইতিহাস।(Copied)